প্রথম অধ্যায়

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী ও সাহিত্য পরিচয়

সাহিত্য এক শ্রেণীর শিল্প কথা। কোন কোন সমালোচকগণ মনে করেন যে, সাহিত্যকে সঠিকভাবে বুঝতে গেলে সাহিত্যিকের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। শরৎচন্দ্রের রচিত উপন্যাসগুলিতে নারীরা বিশেষ ভাবে স্থান পেয়েছে। তাঁর রচনায় হিন্দু ধর্মের ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়েরা আছে, অন্যান্য নিম্নবর্ণের মেয়েরাও আছে। আবার ব্রাহ্ম সমাজের মেয়েদেরও তিনি উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে স্থান পেয়েছে অবিবাহিতা মেয়ে, সধবা নারী এবং বিধবা রমণী।

আমার আলোচনার বিষয় শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে সময় ও সমাজের প্রেক্ষিতে নারীর অবস্থান। লেখকের উপন্যাস সমূহে নারীর অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে শরৎচন্দ্রের জীবনেতিহাস এবং তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

দেবানন্দপুর নামে সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত একটি গ্রাম ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে মাইল দুই উত্তর-পশ্চিম দিকে গ্রামটি। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর (৩১ শে ভাদ্র, ১২৮৩) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায় এবং মাতার নাম ভূবনমোহিনী দেবী। পিতা-মাতার পাঁচ পুত্রের মধ্যে শরৎচন্দ্র ছিলেন জ্যেষ্ঠপুত্র। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় সন্তান। মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা অনিলাদেবী শরৎচন্দ্রের অগ্রজা ছিলেন। শরৎচন্দ্রের অনুজ দুই ভাই প্রভাসচন্দ্র ছিলেন পিতার চতুর্থ পুত্র এবং প্রকাশ চন্দ্র ছিলেন পঞ্চমপুত্র।

শরৎচন্দ্রের পৈতৃক নিবাস দেবানন্দপুরে তাঁর পূর্বপুরুষরা স্থায়ীভাবে বসবাস করেননি। ২৪ পরগণা জেলার অন্তগর্ত মামুদপুর নামে এক গ্রামে তাঁরা বাস করতেন। সেখানকার স্থানীয় জমিদারের বিরুদ্ধাচরণ করায় মতিলালের পিতাকে খুন করা হয়। তারপর মতিলালের মাতা তাঁর পিতৃগৃহ দেবানন্দপুরে চলে যান। সেখানে তাঁর ভ্রাতারা তাঁকে চারকাঠা জমি দিয়ে দেবানন্দপুরে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। মতিলাল দুটি ঘরের একটি পাকা বাড়ি সেখানে তৈরি করে নিয়েছিলেন।

কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় কন্যা ভূবনমোহিনীর সঙ্গে মতিলালের বিয়ে হয়। কেদারনাথের পিতা রামধন মুখোপাধ্যায় চাকরির সুবাদে ভাগলপুরে থাকতেন এবং কেদারনাথ ও তার সব ভাই সেখানেই থাকতেন। কেদারনাথবাবু তার জামাতা মতিলালকেও সেখানে নিয়ে এসে তার পড়াশুনার বন্দোবস্ত করেন। মতিলাল ছিলেন আত্মভোলা ও সংসারের ব্যাপারে উদাসীন। পিতার চরিত্রের এই দিকটি শরৎচন্দ্রের মধ্যেও লক্ষ করা যায়।

শরৎচন্দ্রের ডাকনাম ছিল ন্যাড়া। তার পড়াশোনা কোথায় শুরু হয় এ ব্যাপারে সঠিক জানা যায় না। দেবানন্দপুরে প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালায় পড়ার সময় তাঁর বয়স ছিল পাঁচ বছর। প্যারি পণ্ডিতের পুত্রের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বন্ধুত্ব ছিল। সেই পাঠশালার একটি মেয়ের সঙ্গেও শরৎচন্দ্রের ভাব ছিল। ঐ মেয়েটির সঙ্গে সে গ্রামের পথে, বনে-জঙ্গলে, নৌকায় নদীতে ঘুরে বেড়াতেন এবং মেয়েটি তাকে বৈচি কুলের মালা গেঁথে দিত। তাঁর মাছ ধরার ছিপ তৈরি করতে, ঘুড়ি ওড়াবার সুতোতে মাঞ্জা দেওয়া— এসবেও সাহায্য করে দিত। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের রাজলক্ষ্মী ও 'দেবদাস' উপন্যাসের পার্বতী চরিত্র দুটিতে এই মেয়েটির প্রভাব ছিল বলে অনেকে মনে করেন।

শরৎচন্দ্রের জীবনী থেকে তাঁর মধ্যে দুটো দিক স্পষ্ট হয়। তিনি নির্ভিক চিত্তের মানুষ ছিলেন। আবার তাঁর অন্তরে আর্দ্রতা ও কোমলতার সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়। সরস্বতী নদীতে নৌকায় করে রাতে বিহার করা, গঙ্গা ও যমুনা নদীর উঁচু পাড় থেকে জলে ঝাঁপ দেওয়া, রাত্রে শ্মশানে যাতায়াত করা, বর্ষাকালে প্রচণ্ড স্রোতে নদীতে সাঁতার কাটা— এই ঘটনাগুলি থেকে লেখকের সাহসিকতার পরিচয় মেলে। ছেলেবেলায় পাঠশালায় পড়ার সময় তাঁর দুরন্তপনার খবরও পাওয়া যায়, গ্রামের লোক তো বটেই, এমনকি, পাঠশালার-পণ্ডিত পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে যেতেন তাঁর দুরন্তপনায়। লেখক সমবয়সি তাঁর মণিমামা ও রাজেন্দ্রলাল মজুমদার নামে এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে ভাগলপুরে ঐ সব দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ড করতেন। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের ইন্দ্রনাথ চরিত্রটি এই রাজেন্দ্রলাল ওরফে 'রাজু'র ছায়া অবলম্বনে সৃষ্টি।

'পথের দাবী' উপন্যাসে সব্যসাচী ও 'শেষ প্রশ্ন'-এর রাজেন্দ্রের মধ্যেও এই রাজুর প্রভাব আছে। এই দুরন্ত ছেলেটির মধ্যেই ছিল দয়া, মায়া পরোপকার করার মতো গুণ। ইন্দ্রনাথকে দেখা যায় সে মাছ চুরি করে আবার তা বিক্রি করে ঐ পয়সা গরীব লোকেদের দিয়েছে, অন্নদা দিদির দুঃখে দুঃখ পেয়েছে— এগুলো শরৎচন্দ্রের নিজের অভিজ্ঞতার কথাই লেখা বলে মনে হয়।

শরৎচন্দ্র ছিলেন বাউন্ডুলে ও ভবঘুরে প্রকৃতির। ছোটবেলা থেকেই ভ্রমণের নেশা তার মধ্যে প্রবেশ করেছিল। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে যা লক্ষণীয়। দেবানন্দপুর থেকে কয়েক মাইল দূরে কৃষ্ণপুরে ছিল রঘুনাথ গোস্বামীর আখড়া, সেখানে তাঁর যাতায়াত ছিল। আবার কেউ কেউ বলে শরৎচন্দ্র পায়ে হেঁটে পুরী গিয়েছিলেন এবং গাণিতিক কে.পি. বসুর বাড়িতে উঠেছিলেন।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে জেলা স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৮৯খ্রীষ্টাব্দে হঠাৎ তাঁর পিতা চাকরি ছেড়ে দেন এবং তাঁরা দেবানন্দপুরে ফিরে যান। সেখানে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্তি হন, সেই স্কুলে দশম শ্রেণীর ছাত্র যখন তখন পিতার আর্থিক সঙ্কটের জন্য এক বছর তার পড়াশুনা বন্ধ

থাকে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে অভাবের জন্য মতিলাল আবার ভাগলপুরে শ্বশুরালয়ে চলে যান। সেখানে তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজিয়েট স্কুলে 'ফার্স্ট' ক্লাসে ভর্তি হন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এনট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজে ভর্তি হন।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্রের মাতার মৃত্যু হয়। শরৎচন্দ্রের পিতা এই সময় অভিমানবশত শ্বশুর বাড়ি থেকে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে চলে যান। খঞ্জরপুর গ্রামে গিয়ে ঘরভাড়া করে থাকতে লাগলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর আবেগপ্রবণ মতিলালবাবু সংসারের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন ফলে সংসারের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হয়, অন্নাভাব দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে শরৎচন্দ্র লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে পরিবারের অবস্থা সামলানোর চেষ্টায় বনেলি এস্টেটে একটি চাকরিতে যোগ দেন। কিছুদিন পরেই সেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে ভাগলপুরে গিয়ে গানবাজনা, সাহিত্যচর্চা এসবে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন।

ভাগলপুরে ভট্টপরিবারে শরৎচন্দ্রের তখন যাতায়াত ছিল। সেই পরিবারে কন্যা বালবিধবা নিরুপমা দেবীর সঙ্গে সাহিত্যচর্চা হত লেখকের। ভাগলপুরের সাহিত্যসভার সদস্য ছিলেন তিনি। দেবানন্দপুরে থাকার সময় শরৎচন্দ্র 'কাশীনাথ' এবং 'কাকবাসা' নামে দুটি রচনা শুরু করেছিলেন সেগুলি এই সময় ভাগলপুরে সমাপ্ত করেন। এই সময় তিনি 'বোঝা', 'অনুপমার প্রেম', 'কোরেল' (পরে নাম হয় ছবি) 'শিশু' (পরে নাম হয় বড়দিদি) এইসব গল্প এবং 'বাগান', 'দেবদাস', 'শুভদা', 'ব্রহ্ম দৈত্য' এই উপন্যাসগুলি লিখেছিলেন। এগুলির বেশিরভাগ রচনাই পরে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সময় শরৎচন্দ্র মারি কোরেলি, হেনরিউড প্রমুখ ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের লেখা পড়তেন এবং নিজে St. C. Lara ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন।

১৯০১ সালে থেকে শরৎচন্দ্র বহুদিন নিরুদ্দেশ ছিলেন। বলা হয় তিনি তখন সন্ন্যাসী বেশে ঘুরতে ঘুরতে মজঃফরপুর চলে যান। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে শ্রীকান্ত চরিত্র যে সন্ন্যাস জীবনের উল্লেখ আছে তা তাঁর নিজের সন্ন্যাস জীবনের অভিজ্ঞতার ফল। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে যে 'কুমার সাহেব' চরিত্রটি আছে সেটা ভাগলপুরের এক স্থানীয় জমিদারের আদলে সৃষ্টি। সেখানকার ঐ জমিদারের নাম মহাদেব সাহু যার সঙ্গে শ্রীকান্তের পরিচয় ছিল।

শরৎচন্দ্রের পিতার মৃত্যু হয় ১৯০২ সালে। মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তিনি মজঃফরপুর থেকে ভাগলপুরে চলে আসেন এবং শ্রাদ্ধানুষ্ঠান শেষে রোজগারের জন্য কলকাতায় যান। সেখান থেকে ১৯০৩ সালে ব্রহ্মদেশে পাড়ি দেন। সেখানকার অভিজ্ঞতার প্রমাণ মেলে 'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্ব-এ 'পথের দাবী' উপন্যাসে এবং 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে।

শরৎচন্দ্র ১৯০৩ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত ব্রহ্মদেশে ছিলেন। এই সময় তিনি সেখান থেকে যেসব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তা তাঁর রচিত সাহিত্যে প্রকাশ পেয়েছে। এই সময়ে তিনি মাদকাসক্ত হয়ে পড়েন এবং পতিতাপল্লীতে যাতায়াত শুরু হয়। রেঙ্গুনে থাকার সময় তাঁর নিম্নবিত্ত বাঙালী ও অসহায় নারীদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তখন শান্তি নামে এক মেয়েকে অবাঞ্ছিত বিয়ে থেকে বাঁচাতে নিজেই তাকে বিয়ে করেছেন। পরে প্লেগ মহামারী রোগে 'শান্তি' ও তার শিশুপুত্র মারা যায়। পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্রের জীবনসঙ্গিনী হিসাবে ছিলেন হিরন্ময়ীদেবী। শরৎচন্দ্রের এই বিয়ে সম্পর্কে নানা কথা শোনা যায়। অনেকে মনে করেন ১৯০৭ কিম্বা ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল।

রেঙ্গুনে থাকার সময় শরৎচন্দ্র কয়েকবার কলকাতায় এসেছিলেন। প্রথমে ১৯০৭ সালের নভেম্বর মাসে কলকাতায় আসেন এবং ১৯০৮ সালে ফেব্রুয়ারী আবার ফিরে যান। রেঙ্গুনে থাকার সময় ১৯১৩ সালের পর তিনি সাহিত্য রচনায় বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়েছিলেন। 'চরিত্রহীন', 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'পথ নির্দেশ', 'পরিণীতা', 'পণ্ডিত মশাই' তিনি এই সময় লিখেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের লেখাগুলি প্রথমদিকে প্রকাশিত হয়েছে 'ভারতী', 'যমুনা' ও 'সাহিত্য' পত্রিকায়। পরে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা 'গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স'- এর কর্ণধার হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এই সংস্থার প্রকাশিত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে।

রেঙ্গুনে যেখানে শরৎচন্দ্র চাকরি করতেন সেখানকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর মতের মিল না হওয়ায় তিনি চাকরি ছেড়ে দেন। তখন চরম অর্থকষ্ট হয় ও বিপদে পড়েন। এমন অবস্থায় হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে পথ খরচ বাবদ ৩০০ টাকা এবং অনুদান ১০০ টাকা পাওয়া প্রতিশ্রুতি পেয়ে তিনি পাকাপাকি ভাবে বর্মা ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। হাওড়ার কাছে শিবপুর এলাকায় ভাড়া বাড়িতে থাকেন। এখানে তিনি প্রায় দশ বছর ছিলেন। তাঁর উৎকৃষ্ট রচনাগুলি এই সময়ের সৃষ্টি। যেমন—'বৈকুণ্ঠের উইল', 'অরক্ষণীয়া', 'শ্রীকান্ত' (প্রথম পর্ব), 'দেবদাস', 'নিষ্কৃতি', 'দত্তা', 'গৃহদাহ', 'নব বিধান', 'শ্রীকান্ত' (দ্বিতীয় পর্ব), 'পথের দাবী' গ্রন্থগুলি। তাদের মধ্যে 'পথের দাবী', 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় এবং বাকিগুলো প্রকাশিত হয়েছে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয় হয়েছিল যখন তিনি হাওড়ায় ছিলেন। ১৯১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দে 'বিচিত্রা'-র আসরে। গান্ধিজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন হয় ১৯২১

সালে। এই আন্দোলন দেশজুড়ে সাড়া ফেলে তখন শরৎচন্দ্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আহ্বানে কংগ্রেসে যোগ দিলেন। তাকে হাওড়া জেলা কংগ্রেসে সভাপতির পদ দেওয়া হয়। তিনি ঐ পদে ছিলেন ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক প্রদান করে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে।

পরে রূপনারায়ণ নদীর তীরে 'সামতা' গ্রামে শরৎচন্দ্র একটি বাড়ি তৈরি করেন। ১৯২৫ সাল থেকে সেখানে তিনি থাকতেন। তিনি আরো একটি বাড়ি করেন কলকাতার মনোহর পুকুর রোডে। ১৯৩৪ সালে এটিকে তৈরি করা হয়। সমতায় যে বাড়িটি ছিল লেখক তার নাম দিয়েছিলেন সামতাবেড়ে। এই বাড়িতে থাকার সময় তিনি 'শেষপ্রশ্ন', 'শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব', 'বিপ্রদাস' রচনা করেছিলেন। আরো দুটি উপন্যাস লেখা শুরু করেছিলেন তিনি এখানে থাকার সময় যদিও সেগুলি সমাপ্ত করা হয়নি। এ দুটির নাম— 'শেষের পরিচয়' ও 'আগামীকাল'।

১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে ডি.লিট. উপাধি প্রদান করে তাঁকে সান্মানিত করে। ১৯৩৭ সাল থেকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসকের পরামর্শে হাওয়া বদলাতে তিনি দেওঘরে যান। এতেও শরীরের অবস্থা তেমন ভালো বলে মনে হয় না। তাঁর শরীরে শেষে অস্ত্রোপচার করা হয় ১৯৩৮ সালে ১২ই জানুয়ারি। কিন্তু কোন লাভ হয় না। ১৬ই জানুয়ারি তিনি ইহলোক ছেড়ে অমৃতধামে চলে গেলেন। সাহিত্য জগতের একটি তারা খসে পড়ল। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুভাষচন্দ্র বোস, শ্যামাপ্রসাদ, ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। তাঁর মৃত্যুর এত বছর পরেও বাংলা সাহিত্যে একজন জনপ্রিয় কথাশিল্পী হয়ে রইলেন পাঠককুলের হৃদয়ে।

সত্য ও সুন্দরের সমন্বিত রচনা বর্তমান সাহিত্যের লক্ষ্য করা যায়। সমাজশক্তির বিরুদ্ধে যে অপর এক প্রবল শক্তির প্রভাব পাশ্চাত্য সাহিত্যে দেখা যায় তা শরৎচন্দ্রের রচনায় স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। শরৎচন্দ্রের রচনায় সমাজ শক্তির প্রবল চাপেও ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বজায় আছে। দরিদ্র পীড়িত এই বাংলায় মানুষের অভাব, দৈন্যের আর্তরব তাঁর লেখায় স্থান পেয়েছে। শরৎচন্দ্র মূলত ঔপন্যাসিক। তাঁর ছোটগল্পগুলিও রসগ্রাহী করে সৃষ্টি করেছেন। লেখকের রচিত বেশিরভাগ গল্পই বড় গল্প। শরৎচন্দ্র তার লেখা 'মন্দির' গল্পটির জন্য 'কুন্তলীন' পুরস্কার পেয়েছিলেন। কিন্তু আসলে 'বড়দিদি' পাঠক সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। লেখকের জীবিত থাকাকালীন প্রকাশিত শেষ উপন্যাস 'বিপ্রদাস'। এটি প্রকাশ পায় ১৯৩৫ সালে। বাইশ বছর সময়কালে গল্প ও উপন্যাস মিলিয়ে তিনি মোট ত্রিশটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় 'শুভদা' (১৯৩৮) এবং

'শেষের পরিচয়' (১৯৩৯)। যদিও 'শেষের পরিচয়' উপন্যাসটি লেখা শেষ হওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। পরে রাধারাণী দেবী লেখাটি সম্পন্ন করেন।

শরৎচন্দ্রের রচনার তালিকা :

'বড়দিদি' (১৯১৩), 'বিরাজবৌ' (১৯১৪), 'বিন্দুর ছেলে' (গল্পসংগ্রহ ১৯১৪), 'পরিণীতা' (১৯১৪), 'পণ্ডিতমশাই' (১৯১৪), 'মেজদিদি' (গল্পসমূহ, ১৯১৫), 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬), 'চন্দ্রনাথ' (১৯১৬), 'বৈকুণ্ঠের উইল' (১৯১৬), 'অরক্ষণীয়া' (১৯১৬), 'শ্রীকান্ত' (১ম পর্ব (১৯১৭), 'দেবদাস' (১৯১৭), 'নিষ্কৃতি' (১৯১৭), 'কাশীনাথ' (গল্পসংগ্রহ, ১৯১৭), 'চরিত্রহীন' (১৯১৭), 'স্বামী' (গল্প সংগ্রহ ১৯১৭), 'দত্তা' (১৯১৮), 'শ্রীকান্ত' (২য় পর্ব ১৯১৮), 'ছবি' (গল্প-সংগ্রহ, ১৯২০), 'গৃহদাহ' (১৯২০), 'বামুনের মেয়ে' (১৯২০), 'নারীর মূল্য' (প্রবন্ধ ১৯২৩), 'দেনাপাওনা' (১৯২৩), 'নববিধান' (১৯২৪), 'হরি লক্ষ্মী' (গল্প সংকলন, ১৯২৬), 'পথের দাবী' (১৯২৬), 'শ্রীকান্ত' (৩য় পর্ব ১৯১৭), 'ষোড়শী' (১৯২৭), 'রমা' (১৯২৮), 'তরুণের বিদ্রোহ' (১৯২৯), 'শেষপ্রশ্ন' (১৯৩১), 'স্বদেশ ও সাহিত্য' (১৯৩২), 'শ্রীকান্ত' (৪র্থ পর্ব, ১৯৩৩), 'অনুরাধা', 'সতী', 'পরেশ' (গল্পসংকলন, ১৯৩৪), 'বিজয়া' (১৯৩৪) ও 'বিপ্রদাস' (১৯৩৫)।

শরৎচন্দ্র বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিষয়বৈচিত্র্য নির্বাচন করেছেন। তার রচনায় চিরত্র চিত্রণ শিল্পীর বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়। তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে গ্রামের দরিদ্র, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত সমাজ। জমিদারের কথাও সেখানে স্পষ্টভাবে রয়েছে। আবার সমাজ, সংস্কার, আর্থিক সমস্যা তাঁর সৃষ্টির মূল বিষয় রূপে স্থান পেয়েছে। এইসব রচনায় যেমন আছে অবিবাহিতা মেয়ের জীবনের সমস্যা তেমনি আছে দাম্পত্য প্রেমের কথা। আবার সমাজ বিগর্হিত প্রেমকেও তিনি গল্প ও উপন্যাসে দক্ষতার সঙ্গে বর্ণনা করেছে। মৃত্যুর এতগুলো বছর পার হয়ে যাবার পরও তাঁর সৃষ্টসাহিত্য পাঠকদের কাছে সমাদৃত হয়ে আছে।